মিথ্যার প্রচলিত আকার-প্রকৃতি

[বাংলা – Bengali – البنغالية]

শামসুল হুদা আযীযুল হক

সম্পাদক :

আবু শু'আইব মুহাম্মাদ সিদ্দীক

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2011 - 1432

IslamHouse.com

﴿ أساليب الكذب الشائعة ﴾

(باللغة البنغالية)

شمس الهدى عزيز الحق

مراجعة

أبو شعيب محمد صديق

عبد الله شهيد عبد الرحمن

أبو بكر محمد زكريا

2011 - 1432

IslamHouse.com

মিথ্যার প্রচলিত আকার-প্রকৃতি

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। আমরা তাঁরই প্রশংসা করি, তাঁরই কাছে সাহায্য চাই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁরই উপর বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করি। আল্লাহর নিকট পানাহ চাই নফসের সমস্ত অনিষ্টতা ও কর্মকাণ্ডের কু পরিণতি থেকে। আর আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, তিনি এক। তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। আল্লাহ তাঁর ও তাঁর পরিজন, সাহাবা-ই-কেরাম -রাদিয়াল্লাহু আনহুম- সকলের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।

আবু হুরায়রা -রাদিয়াল্লাহু আনহু- হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মুনাফেকের নিদর্শন তিনটি। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন সে অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, আর তার নিকট কোন আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যদিও সে রোযা রাখে, যদিও সে নামায পড়ে এবং মনে করে সে একজন মুসলিম। [মুসনাদে আহমাদ: ২/৫৩৬]

মুনাফেক এর তিন নিদর্শন

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তিনটি চরিত্র এমন যা মুনাফেক হওয়ার নিদর্শনস্বরূপ। অর্থাৎ এ চরিত্রগুলো মুসলিমের মধ্যে থাকতে পারে না। যদি থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে সত্যিকার মুসলিম নয়, মুনাফেক। নিদর্শন তিনটি হলো (১) যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে (২) যখন কোনো অঙ্গীকার করে, খেলাপ করে ও (৩) তার নিকট কোনো জিনিস আমানত হিসেবে রাখা হলে খেয়ানত করে। এধরনের ব্যক্তি নামেই কেবল মুসলিম। হোক সে নামাযী, অথবা রোযাদার ; কেননা মুসলিম হওয়ার জন্য যেসকল গুণাবলি দরকার, সে তা অর্জন করেনি বরং বর্জন করে চলেছে।

ইসলাম একটি ব্যাপক ধর্ম

আল্লাহই ভাল জানেন, কোত্থেকে আমাদের চিন্তায় এ ধারণা উপস্থিত হলো যে, দ্বীন শুধু নামায-রোযার নাম; কেউ যদি নামায আদায় করে যায়, রোযা রেখে যায় তাহলেই সে মুসলিম হয়ে গেল, এর অতিরিক্ত আমাদের কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, এজাতীয় বিশ্বাস যেন সবার মধ্যে ঠাঁই করে বসেছে। সুতরাং এ ধরনের লেবাসদারি মুসলিমরা যখন বাজারে যাচ্ছে, মিথ্যা ও প্রতারণার ছলে অন্যের সম্পদ হস্তগত করছে। হারাম-হালাল একাকার করে ভক্ষণ করছে। কোনো কিছুরই তোয়াক্কা করছে না। আমানত (গচ্ছিত সম্পদ) দ্বিধাহীনভাবে ভক্ষণ করছে। অধিকার পুরণের কোনো বালাই নেই। মানুষের ধারণা এমন হয়ে গিয়েছে যে, ইসলাম শুধু

নামায রোযার নাম। এটা খুবই ভুল ধারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তি (যদিও নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে মুসলিম হিসেবে ভাবে।) অর্থাৎ তার মধ্যে মুসলিম হওয়ার কোনো যোগ্যতাই বাকি থাকে না। তবে হ্যাঁ, তার উপর কুফর এর ফতোয়া প্রদান করা যাবে না।)

এ প্রবন্ধে উপরে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের উপর স্বল্প পরিসরে গঠনমূলক আলোচনার প্রয়াস পাব বলে আশা রাখি। মানুষের জীবনে ব্যাপক পরিসরে এ বিষয়গুলো হাজির থাকা সত্ত্বেও যেহেতু এ বিষয়ে তাদের ধারণা সীমিত তাই কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করি।

জাহেলি যুগে মিথ্যা

হাদীসে উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটি হলো মিথ্যা বলা। মিথ্যা বলা হারাম। শুধু কেবল আমাদের ক্ষেত্রে হারাম এমন নয়, বরং অতীতের সকল জাতির জন্যেই তা হারাম ছিল। যেমন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রোম সম্রাটের প্রতি ইসলামের দাওয়াতপত্র প্রেরণ করলেন, পত্র পাঠান্তে সম্রাট তার সভাসদদের উদ্দেশ্যে বললেন, এমন কেউ কি আছে যিনি ঐ ব্যক্তি (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে অবগত?

ঘটনাক্রমে কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান ব্যবসায়িক কাজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাকে বাদশার দরবারে উপস্থিত করা হলো। শুরু হলো প্রশ্নোত্তর। এক পর্যায়ে বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন, তার বংশ মর্যাদা কেমন? আবু সুফিয়ান উত্তরে বললেন: তিনি অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন বংশের। তিনি কুরাইশ বংশের এবং সমগ্র আরববাসীর কাছে কুরাইশ বংশের মর্যাদা স্বীকৃত।

পুনরায় প্রশ্ন করা হলো, তাঁর অনুসারীগণ কি বড় বড় ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তি না সাধারণ মানুষ? উত্তরে তিনি বললেন, তার অধিকাংশ অনুসারী সাধারণ ও দুর্বল মানুষ। বাদশা সম্মতি জ্ঞাপন করে বললেন, নবীগণের অনুসারীগণ দুর্বল ও সামর্থ্যহীন লোকেরাই হয়ে থাকেন।

সম্রাট পুনরায় প্রশ্ন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে যখন যুদ্ধ হয় তখন কে জয়লাভ করে? উত্তরে তিনি বললেন, কখনো আমরা, আবার কখনো তারা জয়ী হয়। (তখনও যেহেতু মাত্র দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং উহুদ যুদ্ধে মুসলিমরা কিছুটা হলেও বিপর্যস্ত হয়েছিলেন)।

মিথ্যা বলতে অপারগতা

আবু সুফিয়ান রা. মুসলিম হওয়ার পর বলেন, আমি তখন কাফের ছিলাম, তাই আমার একবার মনে হল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এমন কোনো শব্দ উচ্চারণ করব, যাতে তাঁর সম্পর্কে বাদশার বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাদশা যে ধরনের প্রশ্নাবলি উত্থাপন করলেন, প্রত্যুত্তরে সে মুহূর্তে এমন কিছু বলার সুযোগ ছিল না; কেননা তিনি যা জিজ্ঞেস করছিলেন তার উত্তর আমাকে দিতে হচ্ছিল এবং মিথ্যা বলার কোন সুযোগই ছিল না। আমি

যে সকল উত্তর দিয়েছিলাম সবগুলোই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শানে গুণকীর্তন স্বরূপ হচ্ছিল।

অতঃপর বুঝা যাচ্ছে জাহেলি যুগেও মিথ্যা বলার রীতি চালু ছিল না, এমতাবস্থায় একজন মুসলিম, মুসলিম হওয়ার দাবি করা সত্ত্বেও কি করে মিথ্যা বলতে পারে তা ভাববার বিষয়।

অসত্য মেডিকেল সার্টিফিকেট

পরিতাপের বিষয়, বর্তমান যুগে মিথ্যার ব্যাপকতা এতোই প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, যারা হারাম-হালাল, জায়েয-নাজায়েয এবং শরীয়তের ওপর চলতে চেষ্টা করেন তারাও এ নিকৃষ্ট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, মিথ্যার বহু আকার-ধরনকে তারা মিথ্যার আওতা-বহির্ভূত করে রেখেছেন।

অথচ সে মিথ্যাকাজ করে দ্বিগুণ গোনাহ উপার্জন করছে। প্রথমত, মিথ্যা বলার গোনাহ, দ্বিতীয়ত, গোনাহকে গোনাহ মনে না করার গোনাহ।

একবার এক ব্যক্তি, যিনি অত্যন্ত নেককার, নামায রোযার পাবন্দ ছিলেন, যিকির-আযকারেও লিপ্ত থাকতেন, বুযুর্গদের সহবতেও থাকতেন। তিনি দেশের বাইরে থাকতেন। তিনি একবার দেশে এলেন এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কখন কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন? উত্তরে তিনি বললেন ০৮/১০ দিন পর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। আমার ছুটিও শেষ হয়ে গিয়েছে। তবে আমি গতকালই অতিরিক্ত ছুটির জন্য একটি মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিয়েছি।

দ্বীন কি শুধু নামায রোযার নাম ?

মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রেরণের কথাটি এমনভাবে তিনি বললেন যেন এটা কোনো ব্যাপারই নয়। এটা বরং খুবই সাধারণ বিষয়। তার মধ্যে চিন্তিত হওয়ার নুন্যতম লক্ষণটিও প্রকাশ পেতে দেখলাম না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কীভাবে মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠালেন। উত্তরে বললেন, অতিরিক্ত ছুটি আদায়ের জন্য প্রেরণ করেছি। যদি এমনিই ছুটি চাইতাম তাহলে ছুটি মিলত না। এ সার্টিফিকটের কল্যাণে আমি ছুটি পেয়ে যাব। আমি পুনরায় প্রশ্ন করলাম, আপনি মেডিকেল সার্টিফিকেটে কি লিখেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, তাতে লেখা আছে, আমি এতটুকু অসুস্থ যে এ অবস্থায় আমার পক্ষে ভ্রমণ করা সম্ভব নয়। আমি বললাম, জনাব! দ্বীন কি শুধু নামায রোযার নাম? যিকিরে মশগুল থাকার নাম? আপনার তো বুযুর্গদের সাথে সুসম্পর্কও রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কি করে এ মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠালেন? অথচ আপনি তো সুস্থ ব্যক্তি।

তিনি তৎক্ষণাৎ পরিস্কারভাবে বলে দিলেন, আজই প্রথম আমি আপনার মুখ থেকে এ ধরনের কথা শুনলাম, এও একটি মিথ্যা কাজ? আমি বললাম, জনাব! তাহলে আর মিথ্যা কাকে বলে? উনি জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে অতিরিক্ত ছুটি কিভাবে নেব? আমি বললাম আপনার যতদিন ছুটি একান্ত প্রয়োজন ততদিন ছুটি নেবেন। অতিরিক্ত প্রয়োজন হলে বিনা বেতনে ছুটি গ্রহণ করুন, তাহলে তো আপনাকে এ মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদানের প্রয়োজন পড়ে না।

আজকাল মানুষ মনে করে, মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট পাঠানো মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়, আর দ্বীন তো শুধু নামায রোযা, যিকির-আযকারের নাম। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অহরহ মিথ্যা বলার দিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

মিথ্যা সুপারিশ

একজন বিজ্ঞ, জ্ঞানী ও বুযুর্গ ব্যক্তির একটি সুপারিশ-নামা আমার নিকট আসল। আমি তখন জেদ্দায় অবস্থান করছিলাম। পত্রে তিনি লিখেছেন, পত্রবাহক ওমুক দেশের নাগরিক। তবে তিনি আপনার দেশে যেতে চান। অতএব আপনি দূতাবাসে একটি সুপারিশ লিখে দেন, তাকে যেন আপনার দেশের একটি পাসপোর্ট প্রদান করা হয়, এ সূত্রে যে তিনি আপনার দেশেরই নাগরিক এবং তার পাসপোর্ট হারিয়ে গিয়েছে। এ মর্মে আপনার দেশের দূতাবাসে একটি দরখাস্তও জমা দেয়া আছে। অতএব, আপনি তার সুপারিশটি করে দেবেন।

পাঠকবৃন্দ! আপনারাই বলুন : ওখানে উমরা পালন হচ্ছে, হজ্জ আদায় হচ্ছে, তাওয়াফ ও সায়ী হচ্ছে, সে দেশে অবস্থান করা সত্ত্বেও এধরনের মিথ্যা ও ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে। মনে হয় যেন এসব ব্যাপার তাদের কাছে দ্বীনের কোনো অংশই না। আসল ব্যাপার হল দ্বীনের সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক খুবই ক্ষীণ হয়ে পড়েছে।

মানুষ এটা ধারণা করে নিয়েছে যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যাকে মিথ্যা মনে করে বললেই কেবল মিথ্যা হবে। আর ডাক্তারের কাছ থেকে মিথ্যা মেডিকেল সার্টিফিকেট বানিয়ে নেওয়া, মিথ্যা সুপারিশনামা লিখিয়ে নেয়া অথবা মিথ্যা মামলা দায়ের করা, এগুলো যেন কোনো মিথ্যাই নয়। অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

(সে যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে সদা উপস্থিত সংরক্ষণকারী রয়েছে।) [সূরা কাফ : ১৮]

অর্থাৎ তোমাদের মুখ থেকে যা কিছু উচ্চারিত হয় তা তোমাদের আমলনামায় রেকর্ড করা হচ্ছে।

বাচ্চাদের সাথে মিথ্যা বলা

একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এক মহিলা একটি ছোট্ট বাচ্চাকে কোলে নেয়ার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বাচ্চা কাছে যেতে চাচ্ছিল না। অতঃপর মহিলা বাচ্চাটিকে কাছে নেওয়ার জন্য বললেন : কাছে এসো, তোমাকে একটি জিনিস দেব। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, সত্যিই কি তুমি তাকে কিছু দেবে? না এমনিই তাকে কাছে নেওয়ার জন্য বলছ? মহিলা বললেন, আমার খেজুর দেওয়ার ইচ্ছা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদি তোমার খেজুর দেয়ার ইচ্ছা না থাকত এবং শুধুমাত্র তাকে আহ্বান করাই উদ্দেশ্য হত তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা বলার গুনাহ লেখা হত। [আবু দাউদ: ৪৯৯১]

এ হাদীস দ্বারা আমরা এ শিক্ষা পাই যে, বাচ্চাদের সাথেও মিথ্যা বলা যাবে না। তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যাবে না। নতুবা জীবনের শুরুতেই, মিথ্যা বলা অন্যায় নয়, এমন মনোভাব তাদের অন্তরে প্রোথিত হবে।

ঠাট্টাবশত মিথ্যা বলা

আমরা অনেক সময় হাসি-ঠাট্টাবশত মিথ্যা বলে থাকি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এধরনের মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। একটি হাদীসে এসেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আফসোস করে বলেছেন: ঐ ব্যক্তির জন্য কঠিন শাস্তি, কঠিন শাস্তি, অতঃপর কঠিন শাস্তি যে মিথ্যা বলে, মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে। [আবু দাউদ: ৪৯৯০]

হাসির গল্প, আনন্দদায়ক কথা বা রসিকতা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও করেছেন। কিন্তু কখনো তিনি এমন করেন নি যে, যা অসত্য বা বাস্তবতা-বিরোধী সে ধরনের কোনো কথার আশ্রয় নিয়েছেন। হাদীসে এসেছে, একবার এক বৃদ্ধ মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে এলেন। তিনি আবেদন পেশ করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমার জন্য জান্নাত লাভের দো'আ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে ওমুকের মা! বৃদ্ধারা বেহেশতে যাবে না।

একথা শুনে বৃদ্ধা খুবই উৎকন্ঠিত হলেন, এমনকী ক্রন্দন শুরু করে দিলেন। তিনি ভাবলেন যে কক্ষনোই তার বেহেশতে যাওয়া হবে না। বৃদ্ধার অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করে বললেন যে, কোনো বৃদ্ধমহিলা বৃদ্ধাবস্থায় বেহেশতে প্রবেশ করবে না। বরং আল্লাহ তাদেরকে নতুন সৃষ্টিতে রূপান্তরিত করবেন। অতঃপর পূর্ণযৌবনা-কুমারী হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পড়ে শোনালেন, (নিশ্চয় আমি

তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করব, অতঃপর তাদেরকে বানাব কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়সী) [আল-মু‘জামুল আওসাত: ৫/৩৫৭; নং ৫৫৪৫]

أن امرأة عجوزا جاءته تقول له : يا رسول الله ادع الله لي أن يدخلني الجنة فقال لها : يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز وانزعجت المرأة وبكت ظنا منها أنها لن تدخل الجنة فلما رأى ذلك منها بين لها غرضه أن العجوز لن تدخل الجنة عجوزا بل ينشئها الله خلقا آخر فتدخلها شابة بكرا وتلا عليها قول الله تعالى : { إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا } . وقد حسنه الشيخ الألباني في غاية المرام برقم 375

এখানে দেখা যাচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুন্দর কৌতুক করলেন। অথচ তা বাস্তবতাবিরোধী বা কোনো অর্থেই অসত্য নয়।

অসত্য চারিত্রিক সার্টিফিকেট

বর্তমানে এর ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছে। এমনকি দ্বীনদার শিক্ষিত লোকেরাও এক্ষেত্রে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। মানুষ হয়ত নিজের নামে মিথ্যা চারিত্রিক সার্টিফিকেট সংগ্রহ করছে, অথবা অন্যদের লিখে দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কারো একটি চারিত্রিক সনদ প্রয়োজন। সে কারো নিকট এসে উপস্থিত হলো এবং একটি চারিত্রিক সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ফেলল। লেখক হয়ত লিখে দিলেন, আমি তাকে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ দেখেছি। সে খুব ভাল লোক। তার চরিত্র খুবই সুন্দর।

আফসোসের বিষয় একবারের জন্যেও ভেবে দেখলেন না যে তিনি একটি নাজায়েয কাজ করলেন, বরং এর উল্টো হয়ত তিনি ভেবে নিয়েছেন যে তিনি একটি ভাল কাজ করলেন। কেননা প্রার্থীর জন্য তা খুবই প্রয়োজন ছিল। সে অভাব তিনি পূরণ করে দিলেন। কারো অভাব দূর করে দেয়া পুণ্যের কাজ। এধরণের ভাবনা নিয়ে মিথ্যে একটি সনদ দিয়ে দিলেন, অথচ ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। অথবা কোনো পরিচয়-ই নেই। এহেন অবস্থায় সার্টিফিকেট দাতা যেমন গোনাহগার হবে তদ্রূপ গ্রহীতাও গোনাহগার হবে সমানভাবে।

চরিত্র সম্পর্কে অবগতির দু'টি পন্থা

উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর সামনে এক ব্যক্তি এসে তৃতীয় একজন সম্পর্কে বলতে লাগল যে, অমুক ব্যক্তি খুব ভাল মানুষ। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বলুন তো আপনার কি ঐ ব্যক্তির সাথে কোনো লেনদেন হয়েছে? লোকটি বলল, না। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আপনার কি তার সাথে কোনো ভ্রমন হয়েছে? লোকটি বলল, না। অতঃপর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাহলে আপনি কিভাবে অবগত হলেন যে, তার চাল-চলন ও চরিত্র খুব ভাল।

একজন মানুষের চরিত্র সম্পর্কে তখনই অবগতি লাভ করা যায় যখন তার সাথে কোনো লেন-দেন করা হয়। দ্বিতীয় পথ হলো তার সাথে ভ্রমন করা। আর ভ্রমনের সময় একজন মানুষ

সম্পর্কে একটি চরিত্র-চিত্র ফুটে উঠে। তার চরিত্র, তার কাজ-কর্ম, তার সঠিক অবস্থান, তার আগ্রহ, তার চিন্তা-চেতনা সবকিছুই ভেসে উঠে।

আপনি যদি তার সাথে কোন লেন-দেন করতেন বা ভ্রমন করতেন কেবল তখনই তার সম্পর্কে আপনার এ ভাল মন্তব্য যথাযথ বলে মনে করা হত। কিন্তু যখন আপনার সাথে এ দু'টির একটিও সংগঠিত হয়নি তাই তার সম্পর্কে চুপ থাকাই শ্রেয়। ভাল-মন্দ কোনোটাই বলার দরকার নেই। তাই কারো সম্পর্কে কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে, সে কেমন? তখন উত্তরে কেবল ততটুকুই বলুন যতটুকু তার সম্পর্কে জানেন। আপনি যদি তাকে নামায পড়তে দেখেন তাহলে কেবল এতটুকু বলুন যে নামায পড়ার সময় তো মসজিদে তাকে দেখেছি, তবে এতদভিন্ন অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে আমি অবগত নই।

সার্টিফিকেট একটি সাক্ষীস্বরূপ

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে -

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

(তবে তারা ছাড়া যারা জেনে বুঝে সত্য সাক্ষী দেয়) [সূরা আয-যুখরুফ : ৮৬]

স্বরণ রাখা চাই, যিনি সার্টিফিকেট এর উপর স্বাক্ষর করছেন তিনি প্রকৃতপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করছেন। উপরে বর্ণিত আয়াতের আলোকে সাক্ষী দেয়া তখনই জায়েয হবে যখন সে ঐ বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল হবে। অন্যথায় সাক্ষী দেয়া বৈধ নয়। বর্তমানে অহরহ এমন হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার আদৌ কোনো ধারণা নেই অথচ তাকে একটি চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছেন। এটা তো প্রকাশ্য মিথ্যা, গোনাহ। আর মিথ্যা সাক্ষী তো এমন ভয়ঙ্কর পাপ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে শিরক এর সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করেছেন।

মিথ্যা সাক্ষী শিরক সমতুল্য

হাদীসে এসেছে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসে ছিলেন এ অবস্থায় তিনি সাহাবাদের বললেন, বড় গোনাহ সম্পর্কে কি আমি তোমাদের বলব? সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বড় গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হল কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা তথা শিরক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা। অতঃপর সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন, মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া। (একথা তিনবার বললেন)।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, প্রথমত মিথ্যা সাক্ষীকে তিনি শিরক এর সমপর্যায়ভুক্ত করেছেন, দ্বিতীয়ত, কথাটি তিনবার উল্লেখ করেছেন এবং হেলান দেয়া থেকে সোজা হয়ে বসে বলেছেন। কুরআন মাজীদেও একে শিরক এর সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

সার্টিফিকেট প্রদানকারীও গোনাহগার হবে

মিথ্যা সাক্ষী প্রদান করা, মিথ্যা বলার চেয়েও গুরুতর এবং ভয়ঙ্কর। কেননা এতে কয়েক প্রকার গোনাহ হয়ে থাকে। প্রথমত, মিথ্যা বলার গোনাহ। দ্বিতীয়ত, অন্যকে বিভ্রান্ত করার গোনাহ।

মিথ্যা সার্টিফিকেট যখন অন্যের নিকট পৌঁছবে তখন ঐ ব্যক্তি মনে করবে সে তো খুব ভাল লোক এবং সে কারণে তার সাথে হয়ত কোনো ভালো লেন-দেনও করে বসবে। ফলে তার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। আর সে ক্ষতিগ্রস্থতার দায়ভার ঐ মিথ্যা সার্টিফিকেটপ্রদানকারীর ওপরই বর্তাবে। সুতরাং মিথ্যা সাক্ষীর ভয়াবহতা সম্পর্কে আমাদেরকে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। এটা কঠিন ও শক্ত গোনাহ।

আদালতে মিথ্যা

আজকাল সমাজে এটি প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কেউ অন্য কোথাও মিথ্যা কথা না বললেও আদালত ভবনে মিথ্যা বলবেন-ই। সাধারণ মানুষকে তো এ পর্যন্ত বলতে শোনা যায় যে, মিয়া! সত্য সত্য বলে দাও। মিথ্যা বলতে হয় তাহলে কিছুক্ষণ আদালতে দাঁড়াও।

উদ্দেশ্য হলো মিথ্যা বলার স্থান হলো আদালত ভবন। ওখানে গিয়ে মিথ্যা বল। এখানে পারস্পরিক আলোচনা হচ্ছে, এখানে সত্য সত্য বলে দাও। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিথ্যা সাক্ষীকে শিরক সমতুল্য অপরাধ বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রত্যয়নপত্র

কারো সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে অথবা সত্য জানা থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা বক্তব্যযুক্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা, উদাহরণত সুস্থ্য থাকা সত্ত্বেও কাউকে অসুস্থ্য হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা অথবা পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও পাশ হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা, এসবই হল মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

আমার নিকট অনেক লোক তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রত্যয়ন পত্রের জন্য আসেন। সেখানে এ কথা উল্লেখ করতে হয় যে ওমুক প্রতিষ্ঠানটি বাস্তবিক অর্থেই প্রতিষ্ঠিত আছে। ওখানে অমুক ক্লাশ পর্যন্ত লেখা-পড়া হচ্ছে। এ ধরনের প্রত্যয়ন পত্রের উদ্দেশ্য দাতাদেরকে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব সম্পর্কে আশ্বস্ত করা, তাদের কাছে প্রতিষ্ঠানটিকে গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করা। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য মনও চায় যে, একটি প্রত্যায়ন পত্র লিখে দিই।

কিন্তু এটা তো একটি সাক্ষী, আর যখন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নেই তখন আমি কী করে একটি প্রত্যয়ন পত্র লিখতে পারি? এটা তো প্রকাশ্য মিথ্যা সাক্ষী। তবে হ্যাঁ যদি প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে অবগত থাকি তাহলে আমার অবগতির মাত্রানুযায়ী আমি লিখে দিতাম।

বইয়ের ভূমিকা লেখা একটি সাক্ষী

অনেকেই বইয়ের ভূমিকা লিখে নেওয়ার জন্য আসেন, তারা বলেন যে, আপনি লিখে দিন, এ বইটি ভাল ও সঠিক। অথচ কেউ যখন সম্পূর্ণরূপে কোনো বই না পড়বে অথবা তাতে আলোচিত বিষয়ের উপর পূর্ণভাবে অবগত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কিভাবে তা লিখে দেয়া সম্ভব যে, এটা সঠিক বই? কিভাবে বলল যে, এর মধ্যে কোন ভুল নেই?

অনেক লোক এ ধারণাবশত ভূমিকা লিখে দেন যে, এ ভূমিকার ফলে পুস্তক লেখকের ফায়দা হবে, তার মঙ্গল হবে। অথচ ভূমিকা একটি সাক্ষীস্বরূপ এবং তার সাক্ষীতে ভুল থাকাটাকে মানুষ ভুল হিসেবে মনেই করবে না।

অনেকেই বলেন, জনাব! আপনার কাছে তো সামান্য কাজের জন্যই এসেছি। একটু কষ্ট করে যদি দুই কলম লিখে দিতেন, অথবা একটি সার্টিফিকেট দিতেন তাহলে খুব উপকার হতো, আপনারও কোনো ক্ষতি হতো না? লোকটি অথবা বইটি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে যদি না লিখে দেই তবেই সে মনে মনে বলতে শুরু করে, এই মানুষটি তো খুব খারাপ, কাউকে একটি সার্টিফিকেট পর্যন্ত লিখে দিতে চান না।

অথচ কথা তো তা নয়। মূল বিষয় হচ্ছে, আল্লাহর নিকট জবান থেকে বের হয়ে-আসা প্রতিটি কথারই হিসেব দিতে হবে। যা কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে তা তো আল্লাহর নিকট রেকর্ড হচ্ছেই। জিজ্ঞাসিত হতে হবে যে, তুমি অমুক সুন্দর শব্দসমূহ যা মুখ থেকে বের করেছ তা কোন ভিত্তির উপর করেছ? তা স্বেচ্ছায় প্রনোদিত হয়ে করেছ ; না অনিচ্ছাকৃতভাবে করেছ।

মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকা

প্রিয় পাঠক! আমাদের পরিবেশ মিথ্যার এক ভয়াবহ ব্যাধিতে আক্রান্ত। আর এ ব্যাধিটি দ্বীনদার ব্যক্তি, শিক্ষিত ব্যক্তি, নামাযী, বুযুর্গদের সাথে সম্পর্ক রাখেন, জিকির-আযকারে লিপ্ত এমন ব্যক্তিরাও মিথ্যাকে না জায়েয বা খারাপ মনে করেন না। একটি অসত্য সার্টিফিকেট দেয়াকেও তারা পাপ বলে ভাবছেন না। হাদীসে যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফেকদের নিদর্শন বলতে গিয়ে বলেছেন, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। এ সবই দ্বীনে ইসলামের অংশ। এগুলো দ্বীনের আওতাভুক্ত মনে না করা পথভ্রষ্টতার লক্ষণ। এ জন্য আমাদের এ সব থেকে পরিত্রাণ আবশ্যক।

অসত্য বলার অনুমতি

হ্যাঁ। এমন কিছু বাস্তবতা আছে, যেখানে অসত্য বলার অনুমতি রয়েছে। যেমন যেসকল ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার ব্যাপারে কেউ অপারগ হয়ে পড়ে। মিথ্যা বলা ছাড়া তার অন্য কোনো বিকল্প থাকে না। মিথ্যা না বললে নির্মম অত্যাচারের শিকার হতে হবে যা সহ্য করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হবে না। এ অবস্থায় শরিয়ত অসত্যের আশ্রয় গ্রহণকে অনুমতি দিয়েছে। এখানে কথা হচ্ছে প্রথমত, সরাসরি অসত্য বলা থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে, বরং এমন ঘোর-প্যাচমূলক শব্দ বলতে হবে যাতে এ মুসিবত দূর হয়ে যায়। যাকে শরিয়তের পরিভাষায় তা'রীজ এবং তাওরিয়া বলা হয়। যার উদ্দেশ্য হল এমন শব্দ প্রয়োগ যাতে বাহ্যত শব্দটি অন্য অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ প্রশ্নকারীর দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরে যায়। আর বাস্তবে মনে মনে শব্দের মূল অর্থকেই চিত্রিত করে রাখতে হবে। ঠিক এভাবেই বহুমূখী অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দ বলে নিজেকে সরাসরি অসত্য বলা থেকে রক্ষা করবে।

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর আত্মরক্ষা

হিজরতের সময় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে মদীনার পানে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মক্কাবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে নিয়ে আসার জন্য সর্বত্র গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিল এবং এ ঘোষণাও দেয়া হয়েছিল যে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরে এনে দিতে পারবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে। ফলে মক্কার প্রায় সকল মানুষই, এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

এমতাবস্থায় আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে চেনে এমন এক লোকের সাথে দেখা হয়ে যায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিনত না। আগত ব্যক্তিটি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করলো, আপনার সাথী লোকটি কে? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু চাচ্ছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় কেউ না পাক, শত্রুরা তার অবস্থান সম্পর্কে অবগত না হোক। এমতাবস্থায় তিনি যদি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিচয় দিয়ে দেন তবে মারাত্মক হুমকির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। আর যদি পরিচয় না দেয়া হয় তাহলে অসত্য বলা ভিন্ন অন্য কোনো উপায় থাকে না। তাই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু অত্যন্ত কৌশলে বললেন, "তিনি আমার পথ প্রদর্শক, যিনি আমাকে পথ দেখান।" [বুখারী: ৩৯১১] এখানে প্রশ্নকারী উত্তর শুনে ভাবল, সাধারণত ভ্রমনের সময় যেমন পথপ্রদর্শক থাকে ঐ লোকটিও তাই। কিন্তু আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু মনে মনে অর্থ করলেন যে তিনি আমায় দ্বীনের পথ দেখান, জান্নাতের এবং মহান সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য অর্জনের পথ দেখান।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সরাসরি মিথ্যা বলা থেকে কিভাবে নিজেকে হিফাজত করা হয়েছে। এখানে এমন শব্দ বলা হয়েছে যাতে উপস্থিত সমস্যাও দূর হয়ে গেল এবং অসত্যও বলা হলো না। সার কথা এই যে, কেউ যদি ইচ্ছা করে যে সে অসত্য বলবে না তাহলে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন।

মিথ্যা বলা পাপ এ বিষয়ে বাচ্চাদের মানসিকতা গড়ে তোলা।

বাচ্চাদেরকে সত্যবাদী করে গড়ে তুলতে হবে, মিথ্যাকে যেন তারা ঘৃণা করে সেধরণের মানসিকতা গঠন করতে হবে। বাচ্চাদের সাথে এমনভাবে কথা বলতে হবে যেন তারা মিথ্যা বলার ইচ্ছাপোষণ থেকে বিরত হয়ে যায়। সত্যের প্রতি তাদের আগ্রহ ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। এ জন্য বাচ্চাদের সামনে কেউ যেন কখনো মিথ্যার আশ্রয় না নেয়। কেননা বাচ্চারা মাতা পিতার অনুসরণ করে। মাতা পিতা মিথ্যা বললে বাচ্চারাও মিথ্যাকে স্বাভাবিক ভাববে। তারা মনে করবে মিথ্যা বলা কোনো অন্যায় নয়, কোনো পাপ নয়।

বাচ্চাদেরকে ছোটবেলা থেকেই মিথ্যা থেকে দূরে রাখতে হবে। কেননা বাচ্চাদের হৃদয়ে যা অঙ্কিত হয় তা যেন পাথরে অনেপনীয়ভাবে অঙ্কিত হয়, তা কখনো মুছে যায় না।

ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায় নবুয়্যতের মর্যাদার পরে উচুস্থান হলো "সিদ্দীক" এর স্থান। সিদ্দীক শব্দের অর্থ হলো নিরেট সত্যবাদী। যার কথা ও কাজে বাস্তবতার বিরোধী কিছু থাকে না, থাকার সম্ভাবনা নেই।

কাজের মাধ্যমেও মিথ্যা প্রকাশ পায়

মিথ্যা যেমন মুখের কথায় প্রকাশ পায়, তেমনি অনেক সময় কাজের মাধ্যমেও প্রকাশ পায়। অনেক সময় মানুষ এমন আচরণ করে, যা বাস্তবে প্রকাশ্য মিথ্যা। হাদীস শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

(যা তাকে দেয়া হয়নি এমন বিষয় সম্পর্কে যদি কেউ (দেওয়া হয়েছে বলে) পরিতৃপ্তি প্রকাশ করে তাহলে সে যেন মিথ্যার পোশাক পরিধান করল।) [বুখারী: ৫২১৯; মুসলিম: ২১২৯]

কোনো ব্যক্তি নিজের কাজের মাধ্যমে এমন ভাব প্রকাশ করে যা বাস্তবে সত্য নয়। তার উদ্দেশ্য, বাস্তবে সে যা নয় তা কাজের মাধ্যমে বা অন্য কোন মাধ্যমে প্রকাশ করা। এটি গোনাহ। যেমন কোনো ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে ধনী নয়। কিন্তু তার উঠা-বসা, চলা-ফেরায়, আচার-আচরণে এমন অবস্থা প্রদর্শন করে যে, সে অর্থশালী, সম্পদশালী বলে প্রতিভাত হয়। একে বলে কাজের মাধ্যমে মিথ্যা প্রকাশ। এর বিপরীতে এমন ব্যক্তিও পাওয়া যায় যে বাস্তবে খাওয়া দাওয়ায় খুব ভাল, অন্যান্য ক্ষেত্রেও খারাপ নয়। কিন্তু এমন ভাব প্রকাশ করে যে, তার নিকট কোন কিছুই নেই। সে অত্যন্ত মুখাপেক্ষী ও দরিদ্র ব্যক্তি। অথচ সে ধনী। একে নবী করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজের মিথ্যা হিসেবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং কাজের ক্ষেত্রেও এমন কোনো আচরণ করা অনুচিত না যা অন্যের কাছে বাস্তবতাবিরোধী ধারণা সৃষ্টি করে, যা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত।

নামের পূর্বে বিভিন্ন উপাধির ব্যবহার

অনেককে দেখা যায়, নিজের নামের পূর্বে এমনসব উপাধি লেখে যা বাস্তবসম্মত নয়। যেহেতু প্রচলন হয়ে আসছে এ জন্য কোন যাচাই ছাড়া লেখা শুরু করে দেয়। যেমন কেউ কারো নামের পূর্বে সৈয়দ লেখা আরম্ভ করে দিল। আসলে সে সৈয়দ নয়।

সৈয়দ তো বলা হয়, পিতার বংশনামার দিক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর হওয়া। অনেক মানুষ মায়ের দিক দিয়েও সৈয়দ লেখা আরম্ভ করে। এটি ভুল। যতক্ষণ পর্যন্ত সৈয়দ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হবে, ততক্ষণ তা লিখা উচিৎ নয়। আর নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি খুবই কঠিন।

নামের পূর্বে প্রফেসর বা মাওলানা লেখা

অনেককে দেখা যায় বাস্তবে সে প্রফেসর নয়, কিন্তু নামের সাথে প্রফেসর লেখা আরম্ভ করে দেয়। মূলত, প্রফেসর একটি নির্দিষ্ট পরিভাষা যা বিশেষ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অথবা কেউ তার নামের পূর্বে শায়খ বা মাওলানা লিখা আরম্ভ করল। উদ্দেশ্য, সে মাদরাসায় পড়ায় বা দ্বীনি কাজের সাথে জড়িত এ কথা প্রকাশ করা। অথচ সে কোনো দ্বীনি মাদারাসায় পড়া-লেখা করে নি। বর্তমানে অনেকেই আছে যারা নিয়মতান্ত্রিক শিক্ষা অর্জন করে নি, অথচ নামের পূর্বে মাওলানা লিখে, শায়খ লিখে। এটা বাস্তবতার বিরোধী হওয়ায় মিথ্যা বলে গণ্য হবে। সমাজে একে মিথ্যা মনে করা হয় না। এবং গোনাহের কাজও মনে করা হয় না। এজন্য আমাদের এ সমস্ত অসত্য শব্দ প্রয়োগ থেকে দূরে থাকতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ সমস্ত গোনাহ হতে হেফাজত করুন। আ-মী-ন।